‘মুখতাসারু লাতায়িফিল মাআরিফ’ গ্রন্থের সরল অনুবাদ

জীবনকে কাজে লাগান

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সারা বছরের আমল)

মূল

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী ﵀

সংক্ষেপণ

আহমাদ ইবনু উসমান আল-মাযইয়াদ

মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুহান্না

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ জুবায়ের রাফে

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

সংকলকের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ

'আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন। রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো; এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।'[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ

'তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান আর চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময় এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো।'[২]

আল্লাহ তাআলা বছর ও সময়ের হিসাব জানাকে চাঁদের কক্ষপথের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারও কারও মতে, তিনি এটাকে সম্পৃক্ত করেছেন সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে জ্যোতির্ময় বানানোর সাথে। কারণ, বছর ও মাসের হিসাব জানা যায় চাঁদের মাধ্যমে, আর সপ্তাহ ও দিনের হিসাব জানা যায় সূর্যের মাধ্যমে।

---

[১] সূরা ইসরা, ১৭ : ১২

[২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫

সূর্যের সাথে সালাত এবং সিয়ামের বিধান সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, সূর্য দৃশ্যমান। এর জন্য কোনো রকম হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন পড়ে না। সুবহে সাদিক, সূর্যোদয়, সূর্য হেলে পড়া, অস্ত যাওয়া কিংবা বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া এবং লালিমা অস্ত যাওয়ার সাথে সালাতের ওয়াক্ত জড়িত। আর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের অংশটুকু সিয়ামের সময়।

কিছু হুকুম মানার জন্য বান্দাকে আল্লাহ দৈনিক সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সময়গুলোতে কিছু হুকুম মানা ফরয আর কিছু নফল। ফরয হুকুম হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং নফল হলো নফল যিকর, তিলাওয়াত, তাসবীহ ইত্যাদি। আবার চান্দ্রমাস অনুযায়ীও কিছু হুকুম মানার সময় নির্ধারণ করেছেন। যেমন : সিয়াম, যাকাত এবং হাজ্জ। এখানেও রমাদানের সিয়াম এবং হাজ্জের মতো কিছু হুকুম মানা ফরয আবার কিছু নফল। যেমন : শাবান, শাওয়াল এবং সম্মানিত কয়েকটি মাসের সিয়াম।

কয়েকটি মাসকে তিনি অন্য মাসগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْۚ

‘তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করো না।’[৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

‘হাজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে।’[৪]

আবার কিছু রাত এবং দিনকে অন্যান্য রাত এবং দিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যেমন লাইলাতুল কদরকে হাজার মাস থেকেও বেশি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন এবং শপথ করেছেন দশটি রাতের। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এই দশটি রাত হলো যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ রাত। এ বিষয়ে আল্লাহ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করব।

---

[৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৬

[৪] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭

এই শ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে বান্দাকে আল্লাহ তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা বান্দার জন্য এক গোপন উপহার বিশেষ। সুতরাং সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে। বিশেষ মাস, দিন এবং সময়গুলো কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত উপহার লাভ করে। ফলে জাহান্নাম ও সেখানে থাকা কষ্ট থেকে বেঁচে গিয়ে হয় চিরসুখী।

তাবিয়ি মুজাহিদ ﵀ বলেছেন, "প্রতিটি দিন মানুষকে লক্ষ করে বলে, 'হে আদম-সন্তান! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি। আজকের পরে আমি আর তোমার কাছে ফিরে আসব না। সুতরাং তুমি আমার মাঝে কী কাজ করছ, তা ভেবে-চিন্তে করো।' দিনটি চলে যাওয়ার পর সেটিকে গুটিয়ে নিয়ে তাতে সিলমোহর মেরে দেওয়া হয়। কেবল কিয়ামাতের দিনই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সেই সিলটি ভাঙা হবে।"

হাসান ﵀ বলতেন, 'দুনিয়ার প্রতিটি দিন মানুষকে ডেকে বলে : লোকসকল! আমি তো একটি নতুন দিন। আমাতে যেসব কাজ করা হয় সে ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকি। আজকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।'

উমার ইবনু যার ﵀ বলতেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য আমল করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের এই রাতের আঁধারেও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সত্যিকারের প্রতারিত তো সে ব্যক্তি, যে রাত-দিনের কল্যাণের ব্যাপারে প্রতারিত। আর বঞ্চিত তো সে ব্যক্তি, যে এ দুয়ের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। মুমিনদের জন্য রাত এবং দিনকে আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদের জন্য এ দুটি হলো উদাসীনতার মাধ্যম। তোমরা আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে সতেজ রাখো। কারণ, অন্তর কেবল আল্লাহর যিকরের মাধ্যমেই সতেজ থাকে। কবরে এমন কত রাত্রি জাগরণকারী আছে, যারা নিজেদের রাত্রি জাগরণ নিয়ে পরিতৃপ্ত। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। তারা যখন আগামীকাল আল্লাহর কাছে ইবাদাতকারীদের মর্যাদা দেখবে, তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকবে। সুতরাং চলে যাওয়া সময় এবং রাতগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হও।'

কাতাদাহ ﵀ বলেন, 'মুমিন কখনো রাতে ইবাদাতের কথা ভুলে যায় এবং দিনে তার স্মরণ হয়। আবার কখনো দিনে ইবাদাতের কথা ভুলে যায় এবং রাতে তার মনে পড়ে।' তিনি আরও বলেন, এক লোক সালমান ফারসি ﵁-এর কাছে এসে বলল, আমি রাত জেগে ইবাদাত করতে পারি না। তিনি বললেন, (রাতে ইবাদাত

করতে না পারলেও) দিনে ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকো না।

পরকথা এই যে, কল্যাণ লাভের আশায় এ কিতাবে আমি সালাত, সিয়াম, যিকর, শোকর, খাবার বিতরণ এবং সালাম প্রসারের মতো বছরের বিভিন্ন সময়কার পালনীয় ইবাদাত সংকলন করেছি। যাতে এ কিতাবটি আমার নিজের এবং আমার বন্ধুদের পরকালীন পাথেয় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ হয়ে যায়। অবশেষে আমার এ বিষয়টি আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তো বান্দার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাশাপাশি যারা ওয়াজ ও নাসীহাহ করতে আগ্রহী, এ সংকলনটি তাদের জন্যও উপযোগী। কারণ, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দাকে সতর্ক ও সচেতন করা। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

‘আপনি মনে করিয়ে দিন; কারণ মনে করিয়ে দিলে মুমিনদের উপকার হয়।’[৫]

তিনি এ-ও জানিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাদাকাহ এবং কল্যাণের আদেশদাতাকে তিনি মহা প্রতিদান দেবেন।[৬] আর নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ»

‘যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায়, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে।’[৭]

অবশ্যই এটা এক মহা অনুগ্রহ।

মাসের সাথে সম্পৃক্ত এই পালনীয়গুলো আমি পর্ব হিসেবে বিভক্ত করেছি। মাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি চান্দ্রবর্ষের হিসেবে। মুহাররাম থেকে শুরু করে যুল-হিজ্জাহতে শেষ করেছি। প্রত্যেক মাসের অধীনে তার পালনীয় বিষয়গুলো এনেছি। যে মাসে বিশেষ কোনো পালনীয় নেই, সে মাসে কিছু উল্লেখ করিনি। সবগুলোর শেষে সৌরবর্ষের তিনটি ঋতু তথা বসন্ত, শীত এবং গ্রীষ্মের আলোচনা করেছি। আর কিতাবের পরিশিষ্টে তাওবা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পর্ব রেখেছি। কারণ তাওবা গোটা জীবনেরই অংশ। মাসগুলোর পালনীয় শুরু

[৫] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫

[৬] সূরা নিসা, ৪ : ১১৪-এর মর্মার্থ।

[৭] মুসলিম, ২৬৭৪

করার আগে যিকরের ফযিলত নিয়ে একটি পর্ব দিয়েছি। যাতে যিকরের মাজলিসের উপকারিতাও সন্নিবেশিত আছে। কিতাবটির নামকরণ আমি করেছি—লাতায়িফুল মা'আরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়িফ।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কাজকে একান্তভাবে তাঁর জন্য বানিয়ে নেন। একে যেন তাঁর চিরস্থায়ী নিয়ামাতপূর্ণ শান্তির আলয়ে নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এর বিনিময়ে তিনি যেন উপকৃত করেন আমাকে এবং তাঁর সব মুমিন বান্দাকে। আমাদের দিয়ে যেন করিয়ে নেন তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো। আমাদের যেন তিনি কল্যাণকর মৃত্যু নসীব করেন। তিনি তো পরম সম্মানিত এবং সর্বাধিক দয়াবান। আমীন।

এখন আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করছি। পূর্বে বলা পদ্ধতি অনুসারে আমাদের আলোচনা শুরু হবে প্রথম পর্বের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলাই শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব এবং উপদেশের আলোচনা

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি ততক্ষণ আমাদের মনটা নরম থাকে। দুনিয়ার প্রতি আমরা অনাসক্ত থাকি এবং আমরা আখিরাতের বাসিন্দা হয়ে যাই। কিন্তু আপনার কাছ থেকে উঠে পরিবারের সাথে মিলিত হলে, সন্তানদের আদর করলে, তখন আমরা নিজেদেরকেই চিনতে পারি না। নবি ﷺ বললেন,

«لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ.»

‘আমার কাছে থাকার সময় তোমাদের যে অবস্থা থাকে এখান থেকে উঠে যাওয়ার পরও যদি সে অবস্থা বহাল থাকত, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের ঘরে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করত। তোমরা গুনাহ না করলে আল্লাহ নতুন এক দল সৃষ্টি করতেন। যেন তারা গুনাহ করে, আর তিনি তাদের মাফ করে দেন।’

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সৃষ্টির উৎস কী? তিনি বললেন, ‘পানি।’ আমি বললাম, জান্নাত কী দিয়ে তৈরি? তিনি বললেন,

«لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.»

‘জান্নাতের একটি ইট স্বর্ণের, আরেকটি ইট রুপার। তার গাঁথুনি নির্ভেজাল

মিশকের সুগন্ধি। সেখানকার নুড়ি হলো মুক্তা এবং নীলকান্তমণি। আর মাটি হলো জাফরান। সেখানে প্রবেশকারী (সীমাহীন) নিয়ামাত ভোগ করবে। তারা দুঃখ পাবে না, মারাও যাবে না। চিরস্থায়ী হবে। তাদের পরনের কাপড় কখনো পুরোনো হবে না, আর না তাদের যৌবন ক্ষয় হবে।'[৮]

নবি -এর মাজলিস

নবি ﷺ-এর সাধারণ মাজলিস ছিল আল্লাহর যিকর, তাঁর রহমতের প্রতি আশা জাগ্রতকরণ এবং আযাবের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত। সেখানে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত হতো। হিকমাত, সদুপদেশ এবং দ্বীনের উপকারী আলোচনা চলত। যেমনটা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন উপদেশ দেন এবং নাসীহাহ করেন। ঘটনা শোনান। হিকমাত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করেন। সুসংবাদ দেন এবং সতর্ক করেন।

নবি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুসংবাদ দেওয়া এবং সতর্ক করাই হলো আশা জাগ্রতকরণ এবং ভীতিপ্রদর্শন। ফলে সেসব মাজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মন নরম হতো। তাঁরা দুনিয়ার প্রতি হতেন বিরাগভাজন, আর আখিরাতের প্রতি হতেন আগ্রহী।

মন নরম হওয়ার কারণ

মন নরম হতো আল্লাহর স্মরণের কারণে। আল্লাহর স্মরণে মন ভীত হয়, মন্দ অবস্থা হয় সংশোধিত। সৃষ্টি হয় নম্রতা ও কোমলতা এবং দূর হয়ে যায় রুক্ষতা ও উদাসীনতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়ে থাকে।'[৯]

---

[৮] তিরমিযি, ২৫২৬; আহমাদ, ৮০৪৩; আবূ দাউদ, ২৭০৬; মান : সহীহ। "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সৃষ্টির উৎস কি? তিনি বললেন, 'পানি।'" এ অংশটুকু কেবল ইমাম তিরমিযি ﷺ এর বর্ণনাতে এসেছে।

[৯] সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢

‘মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কম্পিত হয়। এবং আল্লাহর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হলে, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।’[১০]

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣٥

‘সুসংবাদ দিন বিনয়ীদের, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে। যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে।’[১১]

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ۝١٦

‘যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি—আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে? তারা যেন সেসব লোকের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এরপর বহুকাল অতিক্রম হওয়ায় যাদের অন্তর হয়ে গিয়েছিল কঠিন।’[১২]

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

‘আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল-কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে,

[১০] সূরা আনফাল, ৮ : ২
[১১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৫
[১২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৬

তাদের শরীর এতে শিহরিত হয়। তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়।'[১৩]

ইরবায ইবনু সারিয়া ﵁ বলেছেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের অনেক কঠোর নাসীহাহ করলেন। ফলে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত হয়ে পড়ল।[১৪]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেছেন, যে মাজলিসে হিকমাতের প্রচার হয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা হয়, সে মাজলিস কতই-না উত্তম। (অর্থাৎ যিকরের মাজলিস)

এক লোক হাসান বসরি ﵀-এর কাছে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, অন্তরকে যিকরের কাছাকাছি নিয়ে যাও। তিনি আরও বলেছেন, যিকরের মাজলিসগুলো ইলমকে সতেজ করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে।

বৃষ্টিতে ভূমি যেমন উর্বর হয়, যিকরের মাধ্যমে তেমনি সতর্ক হয় উদাসীন অন্তর।

যিকরের মাজলিসের উপকারিতা

যিকরের মাজলিসের[১৫] কারণে দুনিয়াবিমুখতা সৃষ্টি হয়। কেননা, সেখানে দুনিয়ার সমালোচনা, নিন্দা এবং তার প্রতি অনাসক্তির জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। জান্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব, এর প্রতি আশাজাগানিয়া আলোচনা যেমন হয়, তেমনি জাহান্নাম, এর ভয়াবহতা এবং তার প্রতি ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়।

যিকরের মাজলিসগুলোতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। সাকীনা (প্রশান্তি) সেগুলোকে ছেয়ে ফেলে। ফেরেশতারা সেসব বেষ্টন করে রাখেন। আর ফেরেশতাদের কাছে আল্লাহ সেসব লোকদের কথা আলোচনা করে থাকেন। তাদের সাথে থাকা লোকেরাও বঞ্চিত হয় না। সেখানে অংশগ্রহণকারী পাপীর ওপরও আল্লাহর রহমত নাযিল হয়ে থাকে। কখনো দেখা যায়, তাদের মাঝে থাকা এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করেছে। তখন সে ব্যক্তির কারণে মাজলিসের অন্য সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

---

[১৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ২৩

[১৪] আহমাদ, ১৭১৪৫; সহীহ

[১৫] যিকরের মাজলিস বলে ওয়াজ, নাসীহাহ এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করানোর মাজলিস, আলিমদের মাজলিস এবং তিলাওয়াতের মাজলিস উদ্দেশ্য।

মাজলিস সমাপ্তির পর

মাজলিস শেষ হলে সেখানে থাকা লোকেরা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক শ্রেণির লোক তো তাদের প্রবৃত্তি নিয়েই ফিরে যায়। মাজলিসে শোনা কথার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাদের হিদায়াতও হয় না, আবার মন্দ কাজ থেকেও তারা পিছিয়ে আসে না। এই প্রকারের লোকেরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মাজলিসে আলোচিত কথাগুলোই তাদের বিপক্ষে উপস্থাপন করে তাদের আযাব বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরা নিজেদের প্রতি অবিচারকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

‘এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান এবং চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই গাফিল।’[১৬]

আবার কিছু লোক মাজলিসের কথার দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। এরা কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক দল আলোচনা শুনে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে এবং করণীয় জিনিস পালন করে। এই সত্যপন্থিরা ডানদিকে শামিল হবে। আরেক দল এর থেকে আগে বেড়ে নফল আমলে মনোনিবেশ করে। ছোটোখাটো মাকরূহ বিষয়ও এড়িয়ে চলে। পূর্বসুরিদের অনুসরণ করে চলতে আগ্রহী হয়। এরা হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তী।

মাজলিসের আলোচনা স্মরণ রাখা

আলোচনা স্মরণ রাখা এবং ভুলে যাওয়া—এই হিসেবে মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের মানুষ দুনিয়ার বৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে আলোচনা ভুলে যায়। এমনটা সাহাবিদেরও হতো। এজন্য তাঁরা ভীত হয়ে পড়তেন। এটা আবার নিফাক নয়তো! অবশেষে নবি ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করলে তিনি আশ্বস্ত করে দেন যে, এটা নিফাক নয়।

হানযালা উসাইদি ﷺ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, ‘সে কী কথা!’ আমি বললাম, আমরা আপনার কাছে থাকলে, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সে সময় আমরা যেন সরাসরি তা দেখতে পাই। কিন্তু এরপর যখন স্ত্রী, সন্তানসন্ততি এবং ধনসম্পদের মাঝে যাই, তখন অনেক কিছু ভুলে যাই।

---

[১৬] সূরা নাহল, ১৬ : ১০৮

রাসূল ﷺ এই কথা শুনে বললেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً.»

‘যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার কাছে থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি সর্বদা এ অবস্থায় অবিচল থাকতে এবং আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতে, তবে তো ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং রাস্তাঘাটে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হানযালা! ধীরেসুস্থে এটি হবে।’ কথাটি রাসূল ﷺ তিনবার বললেন।[১৭]

এ থেকে বোঝা যায়, সর্বদা আখিরাতের কথা স্মরণ রাখাটা কষ্টকর। অধিকাংশ মানুষই তা পারে না। কিছু সময় স্মরণ রাখলেও দুনিয়ার বৈধ কাজে ব্যস্ত হয়ে তা ভুলে যায়। কিন্তু মুমিনের কাছে এটাও কষ্টকর ঠেকে। এজন্য সে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে।

আরেক ধরনের মানুষ যিকরের মাজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পরও সেখানকার আলোচনা স্মরণ রাখে। এ ধরনের লোকেরা দুই প্রকার। প্রথম ধরনের লোকেরা দুনিয়াবি বৈধ কারবারে ব্যস্ত হতে পারেন না। ফলে মানুষ থেকে তারা হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন। না পারেন তাদের সাথে মিশতে, আর না পারেন তাদের হক আদায় করতে। এজন্য সালাফের অনেকেই হাসতেন না।

আরেক প্রকারের লোকেরা আল্লাহর যিকর, তাঁর বড়ত্ব, তাঁর সাওয়াব এবং শাস্তির কথা স্মরণে রাখেন। তা সত্ত্বেও সশরীরে হালাল উপার্জন, পরিবার পরিচালনা ও মানুষের সাথে মেলামেশার মতো দুনিয়াবি কাজে অংশ নেন। ইলম শিক্ষাদান, জিহাদ করা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের মতো ইবাদাতও তারা মিলেমিশে পালন করে থাকেন। আলোচ্য দুই প্রকারের মাঝে এরাই সর্বোত্তম।

সহীহ মুসলিমে জাবির ﷺ-এর বর্ণনায় এসেছে, খুতবা দেওয়ার সময় নবি ﷺ-এর চোখ দুটো লাল হয়ে যেত, স্বর উঁচু হতো এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত।[১৮]

আবার আয়িশা ﷺ-এর কাছে নবি ﷺ-এর একান্ত জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, ‘তিনি ছিলেন সর্বাধিক নম্র। হাসিমুখে থাকতেন এবং মজাও

[১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫০

[১৮] মুসলিম, ৮৬৭

করতেন।'[১৯]

উপদেশের হাকীকত

উপদেশ হলো চাবুকের মতো, যার মাধ্যমে অন্তরকে আঘাত করা হয়ে থাকে। চাবুক দ্বারা শরীরে আঘাত করলে তাৎক্ষণিকভাবে খুব ব্যথা অনুভূত হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা হালকা হয়ে আসে। আঘাতের তীব্রতা অনুযায়ী যন্ত্রণা বোধ হতে থাকে। আঘাত যত জোরালো হয়, যন্ত্রণাও তত বেশি অনুভূত হয়।

অনেক সালাফের অবস্থা এমন ছিল যে, যিকরের মাজলিস থেকে ওঠার পর তাদের মাঝে স্থিরতা এবং গাম্ভীর্য ফুটে উঠত। কেউ কেউ তো সেখান থেকে ওঠার পর খাবার খেতে পারতেন না। আবার কেউ কেউ একটা সময় পর্যন্ত শোনা বিষয়ের ওপর আমল জারি রাখতেন। আসলে শ্রেষ্ঠতম সাদাকাহ হলো অজ্ঞ লোককে শিক্ষা দেওয়া, অথবা উদাসীনকে সতর্ক করা।

একবার আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়িদ ﵀ লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক চিৎকার করে বলে উঠল, 'থামুন! আপনি তো আমার হালচাল প্রকাশ করে দিয়েছেন।' আবদুল ওয়াহিদ ﵀ কথা থামিয়ে দিলে, লোকটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।

উপদেশ কখন ফলপ্রসূ হয়

সালাফরা বলতেন, 'উপদেশ ফলপ্রসূ হয় যদি সেটা অন্তর থেকে আসে। তখন সেটা শ্রোতার অন্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বক্তার মুখ থেকে বের হওয়া কথা শ্রোতার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'আলিমের উপদেশ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে শ্রোতার অন্তর থেকে তা এমনভাবে সরে যায়—মৃসণ পাথরের ওপর থেকে যেভাবে পানি গড়িয়ে পড়ে।'

আসলে যে আলিম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না সে হলো এমন প্রদীপ, যে মানুষকে আলো দেয় ঠিকই কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে (ঠিক যেন মোমের মতো)।

---

[১৯] ইসহাক ইবনু রাহুয়া, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১০০১

উপদেশ হচ্ছে গুনাহের প্রতিষেধক। অভিজ্ঞ আর সুস্থ চিকিৎসকই কেবল প্রতিষেধক সেবন করাতে পারেন। পক্ষান্তরে গাফিল ব্যক্তি অন্যকে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেই সেবন করার অধিক হক রাখে।

পূর্ববর্তী কোনো এক গ্রন্থে আছে, 'তুমি মানুষকে নাসীহাহ করার আগে নিজেকে উপদেশ দাও। যদি সে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে, তবে তো ভালো। না হয় আমাকে নাসীহাহ করা থেকে বিরত থাকো।'

তবুও মানুষকে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং নাসীহাহ করতে হবে। যদি এমন হয় যে নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপদেশ দিতে পারবে না, তবে তো নবিজির পরে এ কাজের যোগ্য কেউ থাকবে না। কারণ তাঁর পরে কেউ নিষ্পাপ নয়।

হাসান বসরি ﵀-কে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি কাউকে উপদেশ দেয় না। সে বলে, নিজে যা করি না, এমন কথা অন্যকে বলতে সংকোচ বোধ করি। তখন হাসান ﵀ বললেন, 'মানুষ যা বলে, তার সবই কি করতে পারে?—এই চিন্তার মাধ্যমে শয়তান জয়ী হয়ে গেছে। কারণ লোকটি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা থেকে বিরত ছিল।'

সাঈদ ইবনু জুবাইর ﵀ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি ভাবে সে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়ে তবেই সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, তাহলে সে কখনোই তা করতে পারবে না।' মালিক ﵀ বলেছেন, 'সাঈদ ঠিক কথা বলেছেন। কোনো ব্যক্তি কি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পেরেছে?'

হে আল্লাহ! আপনি মহামহিম এবং শ্রেষ্ঠতম দয়াবান! আপনার কাছে প্রত্যাশা করে আপনার জন্যেই আপনার বান্দাদেরকে আপনার দরবারে ডেকে এনেছে, এমন বান্দাকে আপনি খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার সাথে বান্দাদের জুড়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করায়, আমি আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। যদিও নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করতে পারি না। কিন্তু আপনার ব্যাপক উদারতা এবং বদান্যতার কাছে আমরা আশাবাদী। কারণ আপনি উদারতা এবং বদান্যতার অধিকারী। উদার ব্যক্তিও তো তার দস্তরখানে বসা অনাহূত ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করে।

বান্দা গুনাহ না করলে, নতুন এক দল সৃষ্টি

বান্দা গুনাহ না করলে আল্লাহ নতুন এক দল সৃষ্টি করতেন—যারা গুনাহ করত, আর তিনি তাদের তিনি ক্ষমা করে দিতেন। বান্দার অন্তরে আল্লাহ যে উদাসীনতা দিয়ে রেখেছেন, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনই এর মূল উদ্দেশ্য। এ উদাসীনতার কারণেই বান্দা গুনাহ করে ফেলে। তা না হলে উপদেশ শোনার সময়কালীন অবস্থা সবসময় বিরাজমান থাকত।

মাঝেমধ্যে উদাসীন হয়ে গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার দুটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, বান্দা নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি দেয়। নিজের অক্ষমতার কারণে মনিবের সামনে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে আসে। এ অবস্থা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি ইবাদাত করার থেকেও পছন্দনীয়। কারণ অধিক ইবাদাতে আত্মমুগ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, গুনাহের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করে। তাওবা কবুল এবং মাফ করতে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যবাচক নামও তাঁর রয়েছে। বান্দাকে যদি গুনাহ থেকে সর্বদা বিরতই রাখেন, তবে তাঁর এ বিশেষত্ব কার সামনে প্রকাশ করবেন?

জান্নাতের ভিত্তি, গাঁথুনি, নুড়ি এবং মাটির বর্ণনা

আবূ হুরায়রা ﵁-এর প্রশ্নের উত্তরে নবি ﷺ বলেছেন,

«لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.»

‘জান্নাতের একটি ইট স্বর্ণের, আরেকটি ইট রুপার। তার গাঁথুনি হচ্ছে নির্ভেজাল মিশকের সুগন্ধি। সেখানকার নুড়ি হলো মুক্তা এবং নীলকান্তমণি। আর মাটি হলো জাফরান।’

এখানে চারটি বিষয় লক্ষণীয় :

⇨ প্রথমত, জান্নাতের ভিত্তির বর্ণনা। এটা জান্নাতের প্রাসাদের ভিত্তিও হতে পারে, আবার দেয়াল বা সীমানা-প্রাচীরও হতে পারে। দ্বিতীয়টি হওয়াই অধিক সঙ্গত। বিভিন্ন হাদীসে এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। যেমন :